International Conference
On
Śabdārthatattvavimarśaḥ
(शब्दार्थतत्त्वविमर्श :)

5 th & 6 th March, 2019

Proceedings

Editors :

Dr. Swarup Singha, Dr. Uttam Biswas,
Rajib Sinha, Asit Kr. Sau

Organised by : Vidyasagar University
Sanskrit Alumni Association

In Collaboration with : Department of Sanskrit,
Vidyasagar University

Scanned with OKEN Scanner

International Conference
On
Śabdārthatattvavimarśaḥ
(शब्दार्थतत्त्वविमर्श:)

प्रकाशनम्

5 th March, 2019

ISBN – 9789382-399452

मूल्यम् – ५००.००

विद्यासागरविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागीयभूतपूर्वविद्यार्थिपरिषद्
VIDYASAGAR UNIVERSITY SANSKRIT ALUMNI ASSOCIATION
पश्चिममेदिनीपुरम्, पश्चिमवङ्गः

Scanned with OKEN Scanner

মীমাংসাদর্শনে শব্দার্থতত্ত্ববিমর্শ

ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির অন্যতম হল মীমাংসা-দর্শন। 'মন্' ধাতুর উত্তর 'সন্' আ প্রত্যয় যোগে মীমাংসা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল 'মননের ইচ্ছা'। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এই শব্দের পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হয়েছে। সেই অর্থটি হল বিচারপূর্বক তত্ত্বনির্ণয়। বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করে সূক্ষ্ম অর্থের তাৎপর্য নির্ণয় করা হয় যে শাস্ত্রে তাকে মীমাংসাশাস্ত্র বলে।

ভারতবর্ষের আস্তিক দর্শন সমূহের মধ্যে মীমাংসা একান্তভাবে বেদের কর্মকাণ্ডনির্ভর হয়ে স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছে। বেদের দুটি ভাগ যথা- কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। মীমাংসা দর্শন বেদবিহিত কর্মরূপ ধর্মের নিরূপণ করেছে। কর্মকাণ্ডরূপ পূর্ববর্তী অংশ এর বিচার্য বিষয় বলে একে পূর্বমীমাংসা বলে। পক্ষান্তরে বেদান্ত দর্শন বেদের উত্তরভাগ জ্ঞানকাণ্ডের বিচার করায় উত্তরমীমাংসা নামে অভিহিত। পূর্বমীমাংসা জৈমিনিকৃত, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত ব্যাসপ্রণীত।

পরিদৃশ্যমান জগৎ শব্দময়। এই জগতের সমস্ত পদার্থই কোন না কোন শব্দের দ্বারা অভিহিত। এখানে এমন কোন জ্ঞান নেই, যা শব্দানুবিদ্ধ নয়। এই শব্দকে অবলম্বন করেই ধর্মাধর্মব্যবস্থা নির্বাহ হয়, গুরু-শিষ্যোপদেশ-সম্প্রদায় শব্দকে আশ্রয় করেই বয়ে চলে। সংসারযাত্রা নির্বাহে এই শব্দই প্রধান অবলম্বন। নিজ নিজ পরিবারে পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতির সঙ্গে পারস্পরিক ব্যবহার শব্দকে আশ্রয় করেই সম্পন্ন হয়। ভাবের এই আদান প্রদান বিষয়ে শব্দ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ তা নিয়ে বিভিন্ন মহাকবিরা অনেক উদাহরণ দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহাকবি কালিদাসের লেখা 'রঘুবংশম্' মহাকাব্য। এই কাব্যের প্রথমেই মহাকবি মঙ্গলাচরণ করেছেন–

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ।।

শিব-শিবার নিত্যসম্বন্ধ যেমন জগৎসৃষ্টির কারণ, তেমনি শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধেই বস্তূপলব্ধি। মল্লিনাথ বায়ুপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন– শব্দজাতমশেষন্তু ধত্তে শর্বস্যবল্লভা। অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ। পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধও নিত্য, শাশ্বত। পার্বতী-পরমেশ্বর এখানে উপমান, শব্দার্থ এখানে উপমেয়। জগৎকারণ পার্বতী-পরমেশ্বর যেমন কল্যাণের প্রতিমূর্ত্তি, তেমনি শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধও অভীষ্ঠফলদায়ক—

'एकोशब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गलोके च कामधुक् भवति'।

অর্থাৎ শব্দ হল এমন একটি শক্তি যেটি মানুষের অর্থ বোধনে সাহায্য করে এবং একটি শব্দের মধ্যেই এমন একটি শক্তি আছে যেটি কোন স্থানের চিন্তনকে স্থিতিশিল রাখতে পারে।

মীমাংসকের মতে শব্দ নিত্য না অনিত্য ঃ–

মীমাংসকগণ বেদের নিত্যতা এবং অপৌরুষেয়তা স্বীকার করেছেন। বেদ শব্দময় হওয়ায় বেদের নিত্যতা স্বীকার করতে হলে শব্দমাত্রেরই নিত্যতা স্বীকার করা উচিত। এভাবে মীমাংসকগণ শব্দমাত্রের নিত্যতা স্বীকার করেছেন। কোন ব্যক্তি কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিঘাতসংযোগরূপ চেষ্টা করলে আকাশে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ তরঙ্গ কর্ণপটহে আঘাত করলে আমরা সেই শব্দ শুনতে পাই। শব্দ প্রকাশক তরঙ্গ অধিক দূরে যায় না বলে দূরস্থ ব্যক্তি শব্দ শুনতে পান না। এই তরঙ্গ শব্দ নয়, কিন্তু শব্দের প্রকাশক মাত্র। কাজেই তরঙ্গের বিনাশকে শব্দের বিনাশ বলা যায় না। সুতরাং বাগিন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে উৎপন্ন তরঙ্গ শব্দের বাহক এবং প্রকাশক।

মীমাংসক ও শাব্দিক–উভয় মতে শব্দ নিত্য হলেও শব্দের স্বরূপ নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। শাব্দিকমতে স্ফোটাত্মক শব্দ নিত্য, আর মীমাংসকমতে স্ফোট নয়, বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য। শাব্দিক আবার বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেননি। যাই হোক্, উভয় মতে শব্দের বাস্তব নিত্যতা নেই।

মীমাংসকগণের দৃষ্টিতে শব্দ ঃ–

বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করাই হল মীমাংসা শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। মীমাংসা শাস্ত্র যেহেতু বেদার্থবিচারে কৃতসংকল্প এবং বেদ যেহেতু শব্দাত্মক, সেহেতু এই শাস্ত্রে শব্দের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শবরস্বামী তাঁর মীমাংসাভাষ্যে এবং আচার্য শঙ্কর তাঁর বেদান্তভাষ্যে শব্দের স্বরূপ আলোচনা কালে প্রমাণ হিসেবে উপবর্ষের মত উদ্ধৃত করছেন।

Scanned with OKEN Scanner

উপবর্ষ শব্দ বলতে বর্ণগুলিকেই বুঝেছেন (১)। 'গৌঃ' পদটির উচ্চারণকালে প্রথমে 'গ' বর্ণ, তারপর 'ঔ' বর্ণ এবং শেষ বিসর্গ (ঃ) উচ্চারিত হয়। এই কারণে ভগবান্ উপবর্ষ 'গ' প্রভৃতি বর্ণগুলিকেই শব্দ নামে অভিহিত করেছেন (২)। উপবর্ষের পরিষ্কার কথা, শ্রোত্রেন্দ্রিয় যাকে গ্রহণ করে, তা শব্দ। 'গৌঃ' পদটি উচ্চারিত হলে, গ, ঔ এবং বিসর্গ (ঃ) – এই তিনটি বর্ণকেই কান গ্রহণ করে বলে এই তিনটিই শব্দ। মীমাংসকগণ উপবর্ষের এই মতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মীমাংসকগণের মতে বর্ণই শব্দ এবং এই বর্ণই অর্থের বাচক।

মীমাংসকগণ বর্ণ ও ধ্বনি ভেদে শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সঙ্গে অভিঘাত সংযোগের ফলে 'ক' কার প্রভৃতি যে সব শব্দ উচ্চারিত হয়, সেগুলি হল বর্ণ। আর শঙ্খ, ঘন্টা প্রভৃতির শব্দ হল ধ্বনি।

ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে মীমাংসাদর্শনই বেদের প্রামাণ্য স্থাপনে অধিক যত্নবান্ হয়েছেন। বেদ মানুষের দ্বারা রচিত হলে তার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই কারণে মীমাংসকগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্থাপন করেছেন। বেদ শব্দময়, সুতরাং বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করতে হলে প্রথমে শব্দমাত্রেরই নিত্যত্ব স্বীকার করা উচিত। তাই মীমাংসক সম্প্রদায় বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতা সহজেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক, তাহল শাব্দিক এবং মীমাংসক উভয়েই শব্দকে নিত্য বলেছেন ঠিকই। তবে মীমাংসক মতে বর্ণাত্মক শব্দ হল নিত্য। কিন্তু শাব্দিকমতে বর্ণ বা বর্ণসমূহ অনিত্য, ধ্বনির দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য স্ফোটরূপ শব্দই নিত্য।

মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ষষ্ঠ সূত্র হতে একাদশ সূত্র পর্যন্ত জৈমিনি এবং ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শবরস্বামী শব্দনিত্যতার বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। যুক্তিগুলি হল–

১। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সঙ্গে অভিঘাত সংযোগের ফলে শব্দ উচ্চারিত হয়। কাজেই শব্দের উচ্চারণ প্রযত্নসাধ্য। যে যত্নসাধ্য, সে উৎপত্তিশীল। সুতরাং শব্দের যত্নসাধ্যতা তার উৎপত্তিমত্তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের সঙ্গে প্রাণবায়ুর সংযোগ পূর্বস্থিত শব্দকে প্রকাশ করে মাত্র, উৎপন্ন করে না– এরূপ আপত্তিও সমীচীন নয়, কেননা, উচ্চারণের পূর্বে শব্দের অস্তিত্বের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই।

২। জাগতিক ব্যবহারে শব্দের উৎপত্তি সুপ্রসিদ্ধ। 'শব্দ কর', 'শব্দ কর না', 'আমি শব্দ করছি' প্রভৃতি বাক্য সকলে বলে। এভাবে শব্দকে ক্রিয়ার বিষয় বা ক্রিয়া জন্য বলে উল্লেখ করা হয়। যা ক্রিয়াজন্য, তা কার্য অর্থাৎ অনিত্য।

মহর্ষি জৈমিনি প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বাদশ সূত্র হতে সপ্তদশ সূত্র পর্যন্ত এবং ঐ সকল সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী অনিত্যতাবাদীর উক্ত ছয়টি যুক্তির বিপক্ষে নিজেদের মত যথাক্রমে উপস্থাপিত করেছেন–

১। শব্দের উৎপত্তি প্রযত্নসাধ্য হওয়ায় তা অনিত্য– শব্দের অনিত্যতাবাদীরা এই যুক্তি নিতান্তই অসঙ্গত। আসলে পূর্বস্থিত কিন্তু অপ্রকাশিত শব্দই মানুষের যত্নের ফলে অভিব্যক্ত হয়। উৎপত্তির ন্যায় অভিব্যক্তির জন্যও প্রযত্নের প্রয়োজন আছে। পূর্বপক্ষী বলেছেন, শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্নের ফলে উৎপন্ন হয়। পূর্বপক্ষীর এই হেতুকে সদ্ধেতু বলা চলে না, অধিকন্তু হেতুটি ব্যভিচার (অনৈকান্তিক) দোষে দুষ্ট। যে হেতু সাধ্যাধিকরণে থাকে, আবার সাধ্যাভাবাধিকরণেও থাকে, তাকে ব্যভিচারী হেতু বলে। ('শব্দঃ অনিত্যঃ প্রযত্নসাধ্যত্বাত্'– এখানে প্রযত্নসাধ্যত্ব হেতুটি ঘটপটাদি সাধ্যবত্-এ (অনিত্যবস্তুতে) অর্থাৎ উৎপত্তি পক্ষে এবং যা অনিত্য নয় অর্থাৎ (সাধ্যাভাববত্-এ) অভিব্যক্তিপক্ষে থাকায় ব্যভিচারী। ফলকথা, উচ্চারণ-প্রযত্নের দ্বারা শব্দ যে শ্রুতিগোচর হয়, তার দ্বারা শব্দের অস্তিত্বই প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু অনিত্যতা সিদ্ধ হয় না।

২। 'শব্দ কর', 'শব্দ কর না'– প্রভৃতি ব্যবহার হতে শব্দের অনিত্যতা স্থির করা যায় না, কারণ 'ফাঁক (অবকাশ) কর', 'ফাঁক কর না' প্রভৃতি স্থলে 'কর' শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু তার দ্বারা ফাঁক (অবকাশ, আকাশ)-এর অনিত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। যেহেতু 'ফাঁক' আকাশ ছাড়া কিছুই নয়। আর আকাশ হচ্ছে নিত্য এবং বিভু পদার্থ। সুতরাং ফাঁক-এর বেলায় যেমন 'কর' প্রয়োগে আকাশের নিত্যতা ব্যাহত হয় না, তেমনি 'শব্দ কর' প্রভৃতি স্থলেও শব্দের নিত্যতা ব্যাহত হয় না। আসলে 'শব্দ কর' কথার অর্থ– 'শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার অথবা উচ্চারণ কর', কিন্তু ঘটপটাদির ন্যায় শব্দের নির্মাণ করা বোঝায় না।

লক্ষণীয় বিষয়, মীমাংসাশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বেদার্থ বিচার এবং বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার জন্য মীমাংসকের নিকট শব্দ, শব্দার্থ এবং শব্দ ও শব্দার্থের সম্বন্ধ – এই তিনটির নিত্যতা প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যক।

মীমাংসকের দৃষ্টিতে শব্দার্থ ঃ–

Scanned with OKEN Scanner

মীমাংসকগণের মতে শব্দের বাচ্যার্থ হচ্ছে জাতি। এই জাতি নিত্য। মীমাংসকমতে জাতিই হচ্ছে আকৃতিপদার্থ। মীমাংসকগণ বলেন, ব্যক্তিতে শব্দের শক্তি স্বীকার করা যায় না, কারণ ব্যক্তি অসংখ্য হওয়ায় যে বিশেষ ব্যক্তিতে শব্দের শকক্ত থাকবে, কেবল সেই ব্যক্তিই শক্তিদ্বারা উপস্থাপিত হলেও অন্যান্য ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকবে, যেহেতু অন্যান্য ব্যক্তিতে শক্তি নেই। আর শক্তিজ্ঞান ছাড়াই যদি অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত (স্মৃত) হয়, তাহলে উপস্থিতির (স্মৃতির) প্রতি শক্তিজ্ঞানকে আর কারণ বলা যাবে না।

অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতিও পদের বাচ্যার্থ হতে পারে না। কারণ মাটির তৈরী গোব্যক্তিতে অথবা চিত্রিত গোব্যক্তিতে অবয়বসংস্থাপনরূপ গরুর আকৃতি থাকলেও বৈধ গোদান করতে কেউই মাটির গরু দান করেন না। 'গো-কে প্রোক্ষণ কর', 'গো-কে আনয়ন কর'-এ সমস্ত বাক্য মাটির গরুতে প্রযুক্ত হয় না। কেন প্রযুক্ত হয় না ? উত্তর একটাই, তা হল মাটির গরুতে গোত্বজাতি নেই (৩)। গোত্ব না থাকার জন্য মৃদ্‌গবকেতে (মাটির গরুতে) গো শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয় না। সুতরাং অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতি পদের বাচ্যার্থ নয়, জাতিই বাচ্যার্থ।

জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যদি শব্দের বাচ্যার্থ বলতে হয়, তাহলে জাতিকেই বাচ্যার্থ বলা উচিত। কারণ, ব্যক্তি যদি শব্দের অর্থ হয়, তাহলে ঘটাদি সমস্ত ব্যক্তিই গো পদের অর্থ হোক্, কেননা ঘটপটাদিও ব্যক্তি। গো প্রভৃতি পদের প্রয়োগ যেখানে দেখা যায়, সেখানেই গো পদের প্রয়োগ হবে। ঘটপটাদি ব্যক্তি হলেও এগুলিতে গোশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না বলে এগুলি গোপদের বাচ্যার্থ হতে পারে না– এরূপ মতও সমীচীন নয়। কারণ সদ্যোজাত গরুতে গো শব্দের প্রয়োগ পূর্বে দেখা যায়নি বলে তাতে গো শব্দের প্রয়োগ না হোক্ ? অথচ সদ্যোজাত গরুতেও গো শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

ব্যক্তি যদি শব্দের বাচ্যার্থ হয় তাহলে 'এটি গরু', 'এটি গরু'– এভাবেই গোব্যক্তির জ্ঞান হওয়া উচিত, কিন্তু 'এটিও গরু'– এভাবে জ্ঞান হতে পারে না, অথচ হয়। সুতরাং 'এটি গরু', 'এটিও গুরু'– এরূপ প্রয়োগের প্রতি কিছু না কিছু নিয়ামক আছে। যদি বিরুদ্ধবাদী বলেন– গোত্বই সেই নিয়ামক, তাহলে আমাদের পথে (মীমাংসকের মতে) বিরুদ্ধবাদীকে পা রাখতে হল। আমরা (মীমাংসকেরা) বিরুদ্ধবাদীকে প্রশ্ন করব, নিয়ামক গোত্বটি তাঁদের কাছে জ্ঞাত না অজ্ঞাত ? 'অজ্ঞাত'– একথা বিরুদ্ধবাদী বলতে পারেন না, কেননা, অজ্ঞাত গোত্ব নিয়ামক হলে অশ্বাদিশব্দ-প্রয়োগের বেলায় অজ্ঞাত গোত্ব নিয়ামক হোক্ – এরূপ আপত্তি হবে। আর জ্ঞাত গোত্ব যদি নিয়ামক হয়, তবে বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট বিনীত প্রশ্ন– গোত্বের জ্ঞান তাঁরা শব্দ হতে জেনেছেন অথবা অন্য কোন প্রমাণ হতে জেনেছেন। যেখানে অন্য প্রমাণ নেই, সেখানে গোত্বের জ্ঞান স্বীকার করলে গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তি জ্ঞানের পূর্বেই গো শব্দ হতে গোত্বের জ্ঞান সম্ভব–এই মত মেনে নেওয়া উচিত। কারণ, বিশেষণের জ্ঞান না হলে বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান হতেই পারে না। নিয়ম আছে, বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ। আর কারণ তো কার্যের পূর্বভাবীই হয়ে থাকে। সুতরাং প্রথমে গোত্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান শব্দ হতে হয়– একথা স্বীকার করলে জাতিতেই শক্তি স্বীকার করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো, তা হল, একটু আগে বলা হয়েছে– বিশেষণের জ্ঞান আগে না হলে বিশিষ্টের জ্ঞান হয় না। জাতির জ্ঞান আগে না হলে ব্যক্তির জ্ঞান হয় না, যেহেতু বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ। কিন্তু এই মত সকল মীমাংসক স্বীকার করেন না। যাঁরা বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন না, তাঁরা গোব্যক্তিজ্ঞানের জন্য গোত্বজ্ঞানের কারণতাও মানেন না। এঁরা বলেন, গো-ব্যক্তি জ্ঞানের পূর্বে গোত্বের জ্ঞান অসম্ভব, হতেই পারে না; এমনকি প্রত্যক্ষের দ্বারাও হয় না। কারণ, গোব্যক্তির সঙ্গে দ্রষ্টার চক্ষুঃসংযোগরূপ সন্নিকর্ষ হলে তবেই ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয়, আর গোত্বের সঙ্গে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হলে গোত্বজাতির প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষুঃসংযুক্ত ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে জাতি থাকে বলে জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। প্রথমে ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ সন্নিকর্ষ হলে, পরে জাতির সঙ্গে সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হতে পারে। সংযোগের পূর্বে কখনও সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হতেই পারে না। জাতির আশ্রয় ব্যক্তিকে না দেখে পৃথকভাবে শুধু জাতিকে দেখা যায় না। 'সংযুক্তসমবায়' এই শব্দগুচ্ছের মধ্যে বলা-ই আছে, আগে সংযোগ, পরে সমবায়। যদি তাই হয়, তবে সংযুক্তসমবায়-সন্নিকর্ষজন্য গোত্বের জ্ঞান প্রথমে কীভাবে সম্ভব, অর্থাৎ হতেই পারে না। যাই হোক্, জাতিতে শক্তি স্বীকৃতির পক্ষে গৃহীত যুক্তি বিষয়ে মতভেদ থাকলেও সকল মীমাংসকের এক সুর– 'জাতিই শব্দের অর্থ'।

মীমাংসকগণের দৃষ্টিতে শব্দ-শব্দার্থের সম্বন্ধ ঃ–

এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হয় বলে স্বভাবতঃই শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধের অস্তিত্ব এসে পড়ে, যেহেতু শব্দ শ্রবণের পর অর্থের জ্ঞান সর্বানুভবসিদ্ধ। ভগবান্ জৈমিনির মতে বর্ণাত্মক শব্দ এবং আকৃতি (জাতি) রূপ অর্থ উভয়ই নিত্য হওয়ায় শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ হল ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক বা নিত্য (৪)।

Scanned with OKEN Scanner

সম্বন্ধের নিত্যতাবাদী মীমাংসকের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষিগণ বলেন, শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধাভাবই চোখে পড়ে, স্বাভাবিক সম্বন্ধ তো বহু দূরের কথা। তাঁরা বলেন কার্য-কারণভাব, আশ্রয়-আশ্রয়িভাব, নিমিত্ত-নৈমিত্তিক প্রভৃতি সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্ভব নয়। সংযোগ সম্বন্ধও শব্দ ও অর্থের মধ্যে অসম্ভব, কেননা, সংযোগসম্বন্ধ স্বীকার করলে শব্দ ও অর্থের একদেশবিদ্যমানতাবশতঃ (সংযুক্তপদার্থদ্বয় একদেশেই থাকে) ক্ষুর শব্দের উচ্চারণে মুখ ক্ষত-বিক্ষত হত, আবার মোদক শব্দের উচ্চারণ মাত্রই মুখ মোদকের দ্বারা পূর্ণ হত (৫)। কিন্তু তা যখন হয় না অর্থাৎ শব্দের স্থানে বা নিকটে অর্থ উপলব্ধ হয় না বলে বিন্ধ্য ও হিমালয় ভিন্নদেশবর্তী হওয়ায় যেমন পরস্পর সম্বন্ধহীন, তেমনি শব্দ ও অর্থ পরস্পর সম্বন্ধহীন।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধও হতে পারে না। কেন না, অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যেই সমবায় সম্ভব। শব্দ ও অর্থ যুতসিদ্ধ। যুতসিদ্ধ কথায় অর্থ পৃথক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ এরা পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারে। দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধের ন্যায় যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সমবায় নয়। জাতি-ব্যক্তি, দ্রব-গুণ প্রভৃতি স্থলে সমবায় সম্বন্ধই হয়, যেহেতু এরা অযুতসিদ্ধ। প্রলয়কালে যদিও বা জাতি ব্যক্তিকে ছেড়ে কালকে আশ্রয় করে, তথাপি ব্যক্তি কখনও জাতিকে ছেড়ে পৃথক্ থাকতে পারে না। শব্দ ও অর্থ অযুতসিদ্ধ নয়। কেননা, শব্দ থাকে একস্থানে (উচ্চারয়িতার মুখে) আর ঘটাদিপদার্থ থাকে অন্যস্থানে (ভূতলাদিতে)। এভাবে শব্দ ও অর্থের মধ্যে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধ অসম্ভব হওয়ায় এই দু'টি সম্বন্ধনিষ্ঠ সংযুক্তসমবায়াদি সম্বন্ধের কল্পনাও একেবারেই অবাস্তব। তাছাড়া মীমাংসক মতে শব্দ ও অর্থ উভয়ে নিত্য হওয়ায় এদের মধ্যে কার্য-কারণভাব সম্বন্ধ হতে পারে না (৬)। যদি কার্য-কারণাভাবরূপ সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের মধ্যে থাকত, তাহলে শব্দ হত কারণ এবং অর্থ হত কার্য। ফলে কার্যরূপ অর্থ অনিত্য হয়ে যেত। কিন্তু মীমাংসক মতে আকৃতি (জাতি) রূপ অর্থ কার্য নয়, নিত্য। ভূতল ও ঘট অথবা ঘট ও জল প্রভৃতির মধ্যে যেমন আশ্রয়াশ্রয়িভাব থাকে, শব্দ ও অর্থের তাদৃশ সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কারণ, শব্দ ও অর্থ একই আশ্রয়ে থাকে না, শব্দ থাকে আকাশে আর অর্থ থাকে পৃথিবী প্রভৃতিতে (৭)। সুতরাং শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকতে পারে না।

পূর্বপক্ষীর এরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসক বলেন, শব্দ ও অর্থের মধ্যে সংযোগ, সমবায় অথবা কার্য-কারণাদি সম্বন্ধ স্বীকার না করলেও একেবারে সম্বন্ধের অভাব মেনে নেওয়া যায় না। এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হওয়ার ফলে শব্দজ্ঞান হতে আমাদের অর্থবোধ হয়ে থাকে। সুতরাং অন্য কিছু সম্বন্ধ না থাক্, অন্ততঃ বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধকে শব্দ ও অর্থের মধ্যে স্বীকার করতেই হবে।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ যে পুরুষকৃত, তা অনুমানের সাহায্যেও প্রমাণ করা যায়। যেমন 'সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধঃ পুরুষকৃতঃ (কৃতকঃ) পুরুষাধীনত্বাত্ রজ্জুঘটসংযোগবত্"– এরূপ অনুমানের দ্বারা সম্বন্ধের কৃতকত্ব বা অনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। রজ্জু এবং কলশ পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্ হওয়ায়, রজ্জু-কলশের সম্বন্ধ যেমন অপরের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তেমনি অত্যন্তভিন্ন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অপরসম্পাদিত। সুতরাং অনিত্য।

পূর্বপক্ষীর এরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসক বলেন, শব্দার্থের সম্বন্ধকে কৃতক বা কল্পিত বলা যায় না, যেহেতু এরূপ সম্বন্ধের কর্তা অদ্যাবধি নির্ণীত হয়নি। তাছাড়া, প্রমাণ না থাকায় বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তা থাকতে পারেন না। পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ হওয়ায় প্রত্যক্ষমূলক অনুমানাদির দ্বারাও সিদ্ধ হতে পারেন না। কারণ, সাধ্যের সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধ বিশিষ্ট কোনও ধর্ম্ম যদি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হয়, তাহলে সেই সাধ্য প্রমাণান্তরের বিষয় হতে পারে না।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি তোলেন, ব্যাবহারিক জগতে লোকে ঘটশরাবাদির ব্যবহার করলেও সেই ঘটশরাবাদির কর্তা কুম্ভকারকে কে কবে স্মরণ করে ? কেউ স্মরণ করে না বলেই কি ঘটাদির কর্তা কেউ নেই ? অবশ্যই আছে। ঠিক তেমনি, পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তাকে কেউ স্মরণ করুক্ বা না করুক্, সম্বন্ধকর্তা রয়েছেনই। আসলে ঘটাদির দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হওয়ার ঘটাদি কর্তারা নামস্মরণ যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি পদ-পদার্থের সম্বন্ধের দ্বারা লোকব্যবহার নির্বাহ হওয়ায় সম্বন্ধ কর্তার স্মরণও নিষ্প্রয়োজন।

এরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসা বলেন, ঘটশরাবাদি-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত এখানে একেবারেই অসমীচীন। কারণ, ঘটশরাবাদি-ব্যবহারের জন্য তাদের কর্তাকে স্মরণ করার আদৌ প্রয়োজন নেই। কিন্তু বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তার অস্তিত্ব যদি সিদ্ধ না হয় অর্থাৎ সম্বন্ধকর্তা যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা) প্রভৃতি দোষশূন্য– এরূপ নিশ্চয় যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে কষ্ট এবং প্রভূত অর্থব্যয় সাপেক্ষ বৈদিক যাগাদি কর্ম্মে কেউই প্রবৃত্ত হতে অভিলাষী হন না। বেদের কর্তা যদি অজ্ঞাত হন, তাঁর অস্তিত্ব যদি অনির্ধারিত হয় এবং বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তা ও বেদরচয়িতার অভিন্নতা যদি অনবধারিত থাকে, তাহলে বৈদিকবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্যের অনবধারণ হেতু কেউই বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহী হবেন না। অথচ বেদবাক্য শোনা মাত্রই বৈদিক পুরুষ যাগাদিতে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং বেদবাক্যের সত্যিই যদি কোন স্রষ্টা থাকতেন এবং তিনিই যদি শব্দার্থের সঙ্কেতকর্তা হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি লোকের স্মৃতিতে বিরাজ করতেন। যেহেতু বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বেদস্রষ্টা ও সম্বন্ধকর্তার আপ্তত্ব নিশ্চয় একান্তভাবে আবশ্যক।

Scanned with OKEN Scanner

পূর্বপক্ষী হয়ত বলবেন, অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তার অস্তিত্ব প্রমিত হবে। যেমন ঘটাদির কর্তা অজ্ঞাত থাকলেও, কর্তা ব্যতীত তাদের উৎপত্তি সম্ভব নয় বলে অর্থাপত্তির দ্বারা তাদের কর্তা প্রমিত হয়; তেমনি যে সকল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ কৃত হয়নি, সে সমস্ত পদ হতে অর্থবোধ হয় না, অথচ বৈদিক পদ-পদার্থ হতে অর্থবোধ জন্মায়। সুতরাং এই অর্থবোধ পুরুষকৃত সম্বন্ধ (সঙ্কেত) ছাড়া উৎপন্ন হয় না বলে একে (সম্বন্ধকে) কৃত-ই বলতে হয়। আর যদি কৃত-ই হয়, তবে কর্তা বিনা কৃতি অনুপপন্ন হওয়ায় অবশ্যই কোন না কোন কর্তা স্বীকার করতেই হবে। কাজেই অর্থবোধের অনুরোধে বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তা পুরুষ অবশ্য-স্বীকার্য। যদি কৃত সম্বন্ধজ্ঞান বিনাই অর্থবোধ হত, তাহলে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও সর্বপ্রথম শব্দশ্রবণ কালেই সম্বন্ধজ্ঞানপূর্বক অর্থবোধ হত। কিন্তু তা হয় না। সুতরাং অর্থবোধ সঙ্কেতজ্ঞানসাপেক্ষ। সঙ্কেতজ্ঞান আবার পুরুষসাপেক্ষ হওয়ায় কৃতক (কার্য)। আর যা কৃতক, তা অনিত্য।

এরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসক বলেন, সম্বন্ধকর্তা ব্যতীত যে অর্থবোধ হবে না, তা নয়। অন্যপ্রকারে অর্থাৎ ব্যবহারাদি দর্শনের দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞান সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া পদ-পদার্থের সম্বন্ধ বলে দেওয়ার পর অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির অর্থবোধ হয় বলেই যে সে ব্যক্তি সম্বন্ধ করে দেয়, তা নয়। কারণ, অভিনব সঙ্কেতে কর্তার স্বাতন্ত্র্য থাকলেও বৈদিক পদ-পদার্থের বেলায় ঐ স্বাতন্ত্র্য থাকে না। নবজাত শিশুর নামকরণের ক্ষেত্রে পিতা নিজের ইচ্ছানুযায়ী ডিথ, ডবিথ প্রভৃতি অভিনব সঙ্কেত স্থাপন করলেও বৈদিক পদ-পদার্থের সঙ্কেত বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। 'গো' শব্দের অর্থ কেউ অশ্ব বলতে পারেন না। সুতরাং ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধের কারক নয়, কেবল জ্ঞাপক বা বক্তা মাত্র। তিনি কেবল পূর্বস্থিত এবং স্বতঃসিদ্ধ অনাদিসম্বন্ধের উপদেশ জ্ঞাপন করেন। বর্তমান বৃদ্ধগণ যখন অব্যুৎপন্ন ছিলেন, তখন তাঁদের পূর্ববর্তী বৃদ্ধগণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং এই সব ব্যুৎপন্ন বৃদ্ধগণের উপদেশে বর্তমান বৃদ্ধগণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। সেই পূর্ববর্তিগণ আমার তাদের পূর্ববর্তিগণের নিকট হতে ব্যুৎপত্তিলাভ করেছেন। এভাবে পূর্ব পূর্ব ব্যুৎপন্নের নিকট হতে পরবর্তী ব্যক্তি ব্যুৎপত্তি লাভ করে থাকেন। সুতরাং এভাবেই শব্দার্থের সম্বন্ধজ্ঞানের আদি নির্দেশ করতে পারা যায় না বলে শব্দার্থের সম্বন্ধজ্ঞানকে অনাদি এবং সম্বন্ধকর্তার অভাববশতঃ অপৌরুষেয়ই বলা উচিত। অতএব অর্থাপত্তির দ্বারা সম্বন্ধকর্তা সিদ্ধ হতে পারেন না।

তাছাড়া এমন কোন দিনের কল্পনা করা যাবে না, যেদিন শব্দ ও অর্থ পরস্পর পৃথক্ ছিল এবং কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পৃথক্ সেই সব শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটিয়েছিলেন। এছাড়া কতকগুলি শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকলে তো নূতন শব্দের সম্বন্ধস্থাপন একেবারে অসম্ভব। কারণ, যখনই কোন ব্যক্তি পদপদার্থের নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করতে যাবেন, তখন সেই শব্দের সম্বন্ধ তো অসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আর সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যদি কতকগুলি শব্দের সম্বন্ধ স্বাভাবিক বলা হয়, তাহলে কোন্ শব্দগুলির সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং কোন্গুলির অস্বাভাবিক– তা নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য হওয়ায়, হয় সকল শব্দের সম্বন্ধকে স্বাভাবিক বলতে হবে, নয়তো সকল শব্দের সম্বন্ধকে অস্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু সকল শব্দের সম্বন্ধ অস্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু সকল শব্দের সম্বন্ধ অস্বাভাবিক হলে পূর্বোক্ত যুক্তি অনুযায়ী (কিছু শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকলে) নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে স্বাভাবিক অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলাই উচিত। ফলে স্বীকার করতে হবে, সব কালেই শব্দ এবং অর্থ সম্বন্ধ।

এভাবে পদ-পদার্থের সম্বন্ধ নিত্য হলেও অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির প্রথমবার শব্দ শোনা মাত্রই অর্থবোধ হতে পারে না, কারণ পদ-পদার্থের সম্বন্ধ থাকলেও শ্রোতা যদি সেই সম্বন্ধকে জানতে না পারেন অর্থাৎ শ্রোতার যদি সম্বন্ধজ্ঞান না থাকে, তাহলে তাঁর অর্থবোধ হবে না। অর্থবোধের প্রতি পদ-পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান সহকারী কারণ। অন্ধকারাবৃত্ত স্থানে ঘট পূর্ব হতে থাকলেও প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ আলোকের অভাবে তা জ্ঞানের বিষয় হয় না– তার মানে এই নয় যে, আলোকের আনয়নের পূর্বে সেখানে ঘট ছিল না। সেরূপ পদ-পদার্থের সম্বন্ধ পূর্ব হতে থাকলেও শাব্দবোধের সহকারী কারণ সম্বন্ধজ্ঞানের অভাববশতঃ শ্রোতার শাব্দবোধ হয় না।

শব্দ ও অর্থ ভিন্ন দেশে থাকে বলে এদের সম্বন্ধ নিত্য নয়– এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, শব্দার্থের সম্বন্ধ যদি সমবায়, সংযোগ অথবা কার্য-কারণভাবে হত, তাহলে না হয় এরূপ আপত্তি সম্ভব হত। কিন্তু শব্দার্থের সম্বন্ধ যখন সংজ্ঞা-সংজ্ঞিলক্ষণ অথবা প্রত্যায্য-প্রত্যায়ক অথবা বাচ্য-বাচকাত্মক, তখন শব্দার্থসম্বন্ধের অনিত্যতাপত্তি খাটে না। শব্দ শোনার পরেই অর্থপ্রতীতি হয়, নোচেৎ হয় না– এরূপ অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা প্রমাণিত হয়– শব্দার্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ আছে।

সম্বন্ধ উভয়নিষ্ঠ হওয়ায় সম্বন্ধের আশ্রয় সম্বন্ধিদ্বয় অর্থাৎ এখানে শব্দ এবং অর্থ, এদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন একান্তভাবে আবশ্যক। যেহেতু সম্বন্ধিদ্বয়ের কোনও একটি যদি অনিত্য হয়ে যায়, তাহলে সম্বন্ধও অনিত্য হতে বাধ্য। নিত্য ও অনিত্যের সম্বন্ধ অনিত্যই হয়, কেননা, অনিত্য বস্তুটি যখন থাকে না, তখন আশ্রয়ের অভাবে আশ্রয়ী সম্বন্ধ কোথায় থাকবে ? সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ হওয়ার জন্য কেবল একটি আশ্রয়ে থাকতে পারে না। এখানে শব্দ ও অর্থ – এই দু'টি হল সম্বন্ধের আশ্রয়। শব্দ হল বাচক এবং জাতিরূপ অর্থ হল বাচ্য। জাতির নিত্যতা নৈয়ায়িক প্রভৃতি স্বীকার করলেও শব্দকে তাঁরা অনিত্যই বলেন। শব্দ অনিত্য হলে জাতির সঙ্গে তার সম্বন্ধও অনিত্য হয়ে যাবে। ফলে বেদের প্রামাণ্য অনিবার্যভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু বেদের অপ্রামাণ্য মীমাংসকের কাছে দুর্বিষহ। তাই তাঁরা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করতে অত্যন্ত যত্নবান্ হয়েছেন ও শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্ব স্থাপন করেছেন।

উপসংহার

Scanned with OKEN Scanner

ভারতীয় দর্শনে শব্দ ও শব্দপ্রমাণ চর্চার যে ধারা সুদূর বৈদিক যুগ ধরে চলছে, তার গতি চলবে আরও শত-সহস্র ধারায়। শব্দ, অর্থ ও শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ– এই তিনটি শব্দতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকের দৃষ্টিতে শব্দের স্বরূপ, অর্থের স্বরূপ ও সম্বন্ধের স্বরূপ যথাযথ আলোচিত হয়েছে।

টেলিফোন যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দূরে শব্দ প্রেরণ করি। এই যন্ত্রে দুটি বিশেষ অঙ্গ আছে। একটি যন্ত্র মুখের কাছে ধরে শব্দোচ্চারণ করা হয়। এটি একটি লাউড্‌স্পীকার। এই যন্ত্র উচ্চারিত শব্দকে বহুদূরে অবস্থিত একটি বিশেষ যন্ত্রে ঠেলে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় এই শব্দতরঙ্গ সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু টেলিফোন-রিসিভার নামক যন্ত্রকে পাওয়া মাত্রই সেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পুনরায় শব্দতরঙ্গে পরিবর্তিত হয়। রিসিভার (শব্দ গ্রাহক) যন্ত্রটির ভিতরে কৃত্রিম ঝিল্লী সংস্থাপিত থাকে। এই ঝিল্লী সমাগত বৈদ্যুতিক তরঙ্গের চাপে স্পন্দিত হয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে পরিণত করে দেয়। ফলে আমরা শব্দ শুনতে পাই।

তথ্যসূত্র

১। শঙ্কর ভাষ্য বেদান্তসূত্র ১/৪/২৮

২। শাবরভাষ্য মীমাংসাসূত্র ১/১/৫

৩। ন্যায়দর্শন দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক (২/২/৬৪), বাৎস্যায়নভাষ্য

৪। জৈমিনিসূত্র ১/১/৫

৫। শাবরভাষ্য ১/১/৫

৬। শাস্ত্রদীপিকা ১/১/৫

৭। শাস্ত্রদীপিকা, যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী টীকা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ভারতীয় দর্শন, ড. বিপদ ভঞ্জন পাল, প্রকাশক-দেবাশিষ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা-৭০০০০৬, সেপ্টেম্বর, ২০০৪।

২। ভারতীয় দর্শন সমীক্ষা, ড. সুমিতা বসু, সদেশ প্রকাশক, ১০১ সি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা-৭০০০০৬, ২০১১।

৩। শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রন)।

৪। ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা, অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা-৭০০০০৬, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রন)।

নমিতা সাহা

সহকারী অধ্যাপিকা

সংস্কৃত বিভাগ

পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ

namitasaha06@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner